KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200[illegible]	৬৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, (সেন্ট্রাল এভিনিউ নং 2) Place of Publication : কলকাতা - ১২
Collection : KLMLGK	Publisher বীরেন্দ্র নারায়ণ মিত্র
Title অনুভব (ANUBHAV)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 1/1 1/3 1/4 1/8 1/11 2/7	Year of Publication : July 1974 Sep 1974 Oct - Nov 1974 Feb - March 1975 July 1975 / Jan 1976
	Condition : Brittle Good
Editor	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত

অনুভব

কবিতার মাসিক

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

অনুভব

নবপর্যায় বর্ষ ১, সংখ্যা ১
জুলাই ১৯৭৪

কেন কবিতা

কেন কবিতা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় হয়েছে। আগেও সময় হয়েছিল। কেউ উত্তর দিয়েছে, কেউ দেয়নি। যারা দেয়নি তারা নীরবে গেছে। কবিতার সেই ভীরু শহীদদের প্রতি আমাদের করুণা বিস্তর, কিন্তু তাদের সেই সমবেত অক্ষমতার উদ্দেশে অকারণ অশ্রুপাতে কি লাভ? কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগার কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হোক তাদের স্মৃতিস্তম্ভ।

কেন কবিতা? উনিশ শতকে এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছিলেন রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রবীন্দ্রোত্তরকালে জীবনানন্দ দাশ।

সম্প্রতি একজন কবিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কবিতা কি?

তিনি বললেন, 'কবিতা হল জীবনের সুন্দরতম আর্তনাদ।' তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, 'সে আর্তনাদ কারুকার্যময়, ভয়ঙ্কর হলেও আকর্ষনীয়। অনন্ত দুঃখকে আমরা লালন করি কবিতার মধ্যে। সে আর্তনাদ সঙ্গীত হয়ে আকাশের রঙ আর মাটির স্পন্দনে ব্যক্ত হয়। সে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে মানুষের কণ্ঠ থেকে, কিন্তু সে কণ্ঠস্বর পুরোপুরি মানুষের নয়।'

'কবি কারো বশ্যতা স্বীকার করে না'। তিনি বললেন, "সেইজন্যেই পাপ-পুন্যের বিচারে আর কবিতা বিচার্য নয়, তাহলে তো কবিতা লেখাই যায় না। কবিরা চিরকালই গুরুজনদের অসম্মান করে এসেছে, ভবিষ্যতেও করবে। তথাকথিত ধার্মিকদের কাছ থেকে দূরে থাকুন—ধর্ম তো আস্তিকেরও আছে, নাস্তিকেরও আছে। কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের সঙ্গে কথা বলবেন না, ওরা কবি আর প্রকৃত শিল্পীদের ভুল পথে নিয়ে যায়।"

তাঁর হিতোপদেশকে আমরা শিরোধার্য করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারিনি। কেন কবিতা? এ প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে! ঐ যে ছেলেটা কফি হাউসে আসে মদ খেয়ে, বলে, বুড়োদের দিয়ে কিস্‌সু হবে না, তার কাছ থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া দরকার। ও কিংবা ওর মতো আর কেউ নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে পারবে! কবে?

ধীরে রজনী, ধীরে·····!

অনুভব ক্রমশ উত্তর দেবে এ প্রশ্নের, কবিতা কি? কেন কবিতা?

কবিতা, কবির জীবন

কিছু স্মৃতি // রাম বসু

কবিতা তখনও লেখা হত, এখনও লেখা হয়, ভবিষ্যতেও লেখা হবে। তবু অস্বস্তির শেষ নেই। সময় পালটে গেলে অনেক কিছুই পালটে যায়; সেজন্যেই বোধহয় অস্বস্তি কোনোদিন যাবে না।

নিজের কথাই বলি।

কাঁচা বয়সে একটা কবিতা লিখেছিলাম 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' নামে। তখন ভাবতাম কবিতা সকলের জন্য—সাধারণ অসাধারণ সকলের কাছেই তা বোধগম্য হবে। তখনই আমার কাছে ঐ কবিতাটির অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছিল। যাঁরা জীবনধর্মী কবিতায় বিশ্বাস করতেন তাঁদের কবিতায় যেমন আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না, তেমনি যাঁরা ঐ বিশ্বাসের প্রতিকূলে বসে কবিতা লিখতেন তাঁদের রচনাও আমাকে আকৃষ্ট করত না। কেবল একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' লিখেছি ১৯৪৮ কি ৪৯ সালে। সমস্ত শর্ত পূরণ করে কবিতাকে যে স্তরে নিয়ে গেলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়—এ কবিতায় সে সমস্ত শর্ত পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমি যা চেয়েছিলাম তা প্রত্যাশারও অতিরিক্ত পেয়েছি। তখন ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে যে কৃষক আন্দোলন চলছিল এবং যাঁরা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁরা ঐ কবিতাটিকে খুবই পছন্দ করতেন এবং আন্দোলনের কাজে কবিতাটিকে নানাভাবে ব্যবহার করেছিলেন। শুনেছি, শহর অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরাও কবিতাটিকে অপছন্দ করেন না।

কবিতার মূলে বোধহয় একটা আইডেনটিফিকেশান থাকা দরকার। আমাদের মতো যাঁরা মধ্যবিত্ত তাঁরা প্রায় সব সময়ই সকলের সঙ্গে মিশে থাকেন, সহজে আলাদা হতে পারেন না। তবু কোনো কোনো সময়ে কেউ কেউ আইডেনটিফায়েড হয়ে যান। আমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে।

কবিতাটি যখন লিখি তখন মনে তেজ ছিল, সহজ বিশ্বাস ছিল। ফলে ভাবতাম, কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা সবকিছু পালটে দিতে পারব। আমাদের চারপাশে যে সামাজিক ব্যবস্থা, সেটা প্রাগৈতিহাসিক। সেটাকেও ভেঙে দিয়ে আমরা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব—এ রকম বিশ্বাস ছিল মনে মনে। এখন মনে হয়, সে যেন রূপকথার গল্প। অথচ সেটা অসত্য ছিল না।

মনে পড়ে, ঐ কবিতাটি লিখতে আমার সময় লেগেছিল দশ মিনিট। বিষয় ভেতরে ছিল, ইমেজগুলি এসে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। হরিনাথ দে রোডের কাছাকাছি ছিল বিমল ভৌমিকের মেস। ওখানে আমি আর জ্যোতি রায় যেতাম আড্ডা দিতে। সেদিন সন্ধের পর কবিতাটি পড়ে শোনালাম। সব্বাই হই চই করে উঠল, দারুণ! সবাই আমাকে নিয়ে নাচানাচি জুড়ে দিল। এরকমই রেওয়াজ ছিল তখন। কেউ কবিতা লিখলে বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনাত, তাদের মতামত নিত। এখন আর তেমনটি হতে দেখি না।

কবিতাটি ছাপা হল 'অগ্রনী'তে। সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। আমার আত্মপ্রকাশের জন্য যা কিছু করেছে ঐ অগ্রনী, ছাত্র ফেডারেশনের বন্ধুরা, এবং কমিউনিস্ট পার্টির নিচু স্তরের কর্মীরা। 'পরিচয়'-এর মতো নামী কাগজে তখনও আমার কবিতা ছাপা হত না।

তখন আমাদের আরেকটা রেওয়াজ ছিল, মিটিংয়ের আগে কবিতা পাঠ। ভাবতাম, মিটিংয়ের লোকেরা যদি ভালো বলে, তাহলেই কবিতার পাশ মার্ক পাওয়া গেল। তত্ত্বও ছিল একটা। যাকে পছন্দ করতাম না, সেই এলিয়টের উক্তি ছিল আমাদের শিরোধার্য— পোয়েট্রি ইজ ফেল্ট বিফোর ইট ইজ আণ্ডারস্টুড।' তাই আমি যা লিখতুম, যাদের জন্য লিখতুম, তাঁরা যদি আমার কবিতায় আপ্লুত হতেন, তাহলেই ভাবতাম—বড় কিছু পাওয়া গেল।

অনেক সময় আমাদের মনে পড়ে যেত লোরকার কথা। তাঁর কবিতা নাকি স্থানীয় স্প্যানিশদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁকে মেনে নেন। ঠিক হোক, ভুল হোক ঐ সময়ে আমাদের মনে খুব স্পর্ধা ছিল। একে অনেকে মনে করতেন, অহঙ্কার। সেটা ভুল। স্পর্ধা যেটা ছিল, সেটা স্বাতন্ত্রের জন্য—আইডেনটিফিকেশানের জন্য।

আহত পাহাড় // রাম বসু

বিষণ্ণ সূর্য, লক্ষ মুখ শিখাও নিবু নিবু
শেষ রশ্মি-বল্লম দূরাহত পাখির ডানায়
স্তব্ধ, স্তব্ধতায় রক্তজবা নদী ক্রমশ মলিন
পাথুরে নৈশব্দ্য পটে ঝিল্লির ডাক, ঝর্নার কান্না, পশুর পদশব্দ।

ওদিকে স্বর্ণশিকারীর বাণবিদ্ধ খনিজ পাহাড়
দীর্ঘ দিনমান রক্তাক্ত, কৃষ্ণচূড়া দিক সীমায়
ভয়ঙ্কর। অবলুপ্ত অতীতের পুঞ্জীভূত জ্বালায় জ্বলছে, জ্বলছে।

কোথায়, কোথায় সেই দৃপ্ত যৌবনা প্রান্তর
অতৃপ্তরতি গরবিনী মানবীর প্রখরতা
সে কি এই রিক্তশ্যাম, বহু ধমিতা, উলঙ্গ ;
সে কি ওই ?

চা লোহার রঙ-লাগা নিরেট আকাশের নিচে
গা-খোঁড়া রক্তাক্ত খনিজ পাহাড়
যেন শেকল বাঁধা রূপকথার বন্দী
তার কপাল গড়ানো রক্তে এই মাটি লাল
বুকের পাঁজর ভাঙা ঘূর্ণি মারে ঝর্ণার ডাক
ঠিকরে আসা চোখের মণির প্রতিবিম্বে সপ্তমির আলো
হাটুগড়া পিঙ্গল দেহ স্পন্দিত ; দুই হাতের টানে
সমুদ্র ফিরে যাবে যেন
যেন বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে পৃথিবী
অন্তহীন শূন্যে পাখির মত উড়ে যাবে।

আমি সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সম্মোহিত
রোমাঞ্চকর যন্ত্রণার জন্মদ্বারে রূপান্তর
বেদনার মেঘময় মুকুট মাথায়
জনপদ গিরিমরু মনে সে আমার স্বপ্নভার ছায়া ইন্দ্রধনু।

ডাকে ময়ূরকণ্ঠী আকাশ থেকে তামস-তপস্বী পাতাল
নিচে মাটি, নদী, শ্রম, ভালোবাসা, মানুষের মুখ
আশ্চর্য ঐকতানে বিচিত্র মুখর ; মুখরিত
রাত্রির হাতে সংজ্ঞাতীত কালের তন্দুরা
বনময় ঝর্ণার গান, পাখির ডাক, নক্ষত্র দৃষ্টি
আমার রূপ,—আমার রূপ স্বপ্ন ভারাতুর।

বলতে পার স্পর্ধা

বলতে পার স্পর্ধা
আমি ছাড়া আর কে স্পর্ধিত হবে, কে ?

আমি নিজেকে মেলে দিয়েছি নিরাসক্ত নগ্নতায়
রিক্ততার চন্দন ভস্ম আমি মেখে নিয়েছি সর্বাঙ্গে
এখন অনেকেই আমাকে ধরে নেয় ভোরের বনভূমি বলে

আমার শিরায় প্রবাহিত নিষ্ঠুর বসন্ত, তাই
হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে উঠতে পারি
বাঘিনীর কাল এসেছে বলে বালিয়াড়ি নীলকান্ত মণি
আর সমস্ত উদ্ভিদ জগৎ রামধনু হয়ে যায় উচ্ছ্বাসে
বীণার চেয়েও নিবিড় উচ্চারণে ভরে যায় সত্তার অন্ধকার

তোমরা মানচিত্র চিহ্নিত করতে পারনি বলে বিপন্ন
আতিশয্যের কম্বলে ঢাকা রোগীর মতো ক্লান্ত আর্তনাদ তোল
চেয়ে দ্যাখো ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় অমিতবিক্রম সিংহ
সূর্যটাকে খাবা মেরে ছিঁড়ে এনে মুখে পুরেছে'

আমিই জলের অঞ্জলি তুলে বলি ঃ
পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি
বলতে পার স্পর্ধা
আমি ছাড়া কে স্পর্ধিত হবে, কে ?

সময় এখন ।। মনীন্দ্র রায়

তোমার ঐ বেড়ার পাশে ছিল
অপরাজিতার নীল,
তোমার ঐ ডোবার জলে ছিল
চোলকল্‌মির হাল্‌কা বেগুনি.
আর এখন পোড়া মোবিলের মতো
কাল্‌চে সবুজ গঙ্গার জলে
ভেসে যায় শুধু খড়ের প্রতিমা…

পরের বৌ ভাগিয়ে নেওয়া
বিষিয়ে ওঠা প্রেমের মতো
আমাদের ভাঙা সাঁকো দ্যাখো
ভয়াবহভাবে মাঝ পথে ঝুলছে,
সময় এখন স্টার্ট-ফেল-করা বাসের ইঞ্জিনে
অ্যাক্‌সিলেটার-চাপা আর্তনাদ,
হায় বিলায়েত খাঁর সেতার, হায় নীরদ মজুমদারের ছবি,
হায় জীবনানন্দের কবিতা, শম্ভু মিত্রের অভিনয়,
শরতের অপরূপ মেঘের বৃষ্টিহীনতায়
সবই এখন খরার ফুটিফাটা মাঠের ওপরে শূন্যের ইন্দ্রজাল.
একটা মরা কাছিমের চিৎ করে ফেলা খোলার মতো
তোমার গ্রামের পর গ্রামে এখন
নগ্ন বীভৎসতার স্তব্ধ হাহাকার।

আত্মজৈবনিক সনেটকল্প/১৯ ।। পবিত্র মুখোপাধ্যায়

যা কিছু সঞ্চয়   তা কি ফেলে আসি পলাতক শৈশবের কাছে ?
শৈশব   অরোগ ঋতু, সম্ভাব্য সকলি যার হাতে, পারে অসম্ভব যা কিছু ঘটাতে ;
দয়া ও কার্পণ্য, প্রেম-হিংস্রতা, কুসুম-কীট যুগপৎ থাকে তারই মুদ্রায়, স্বভাবে ;
ফেলে বা ছড়িয়ে তবু নিঃস্ব নয় ; তার ক্ষেতে সম্বৎসর ফসলের ঋতু ;
শুধুই সঞ্চয়, শুধু আমন্ত্রণ নক্ষত্রের, শিশু ও বৃদ্ধের, শুধু ফুলেদের, ভীষণ মৃত্যুরও ;
কেননা প্রিয়তা নয় মুখাপেক্ষী, শর্তাধীন ; তার নম্র হাতে
যাদুদণ্ড ; ময়ূর নাচাতে সর্প সঙ্কুল মাটিতে পারে ; অথবা সে নিজেই ময়ূর হতে জানে ;
খরাক্লিস্ট প্রবীণের মুমূর্ষু প্রত্যহে আনে বিমূর্ত বর্ষার সম্ভাবনা।

আর   আমাদের মধ্য খরদিনে, মুহুর্মুহু ঋতু বদলের দিনে, হেমন্তের দিনে
যখন দুর্বহ শীতে ন্যুব্জ জানু পেতে চায় শয্যার আরাম,
গ্রস্ত বা বিষাদে, ভ্রান্ত প্রয়াসের ধাতু ভারে, আভ্যাসিক শৃংখলে পীড়নে
বেড়ে যায় শ্বাসকষ্ট, বন্ধুদের দীর্ঘছায়া ঢলে পড়ে পশ্চিমে ;   একাকী
জনতায় হাঁটি, বসি পার্কের মসৃণ ঘাসে, আত্মজের বৈরীতায় মৃতকল্প, দেখি—
অরোগ ঋতুর কাল শৈশব দিয়েছে খুলে অফুরাণ স্মৃতি ও সান্ত্বনা।

বুকের ভিতরে কেউ ।। গণেশ বসু

বুকের ভিতরে কেউ বুক রেখে কোনোদিন কথাও বলেনি
যেন জন্মসূত্রে আমি বয়ে যাই দীর্ঘশ্বাস, করাতের করুণ সঙ্গীত
আমার চেতনা জুড়ে, খঙ্গে মুগ্ধ ঢেউ তুলে থাকে
ধুলোমাখা ছায়াগুলি, মরা ঘাসে পা ডোবায় ঝুলন উৎসব
কুড়ুলের গান গেয়ে, চোখের ভিতর
গজায় ব্যাঙের ছাতা, নর্দমার ঘোলা জলে সূর্য ভাসে, কেউ
দিগন্ত বাঁধেনি আজো বাহুর মাদলে, জন্মসূত্রে
বিসর্জনী বাজনা বাজে দিনে রাতে সত্তার উত্তালে।

বত্রিশ বছর ধরে কি পেলাম মাধ্যাকর্ষণের টানে ? আমার সঙ্গীত
দেশময় শস্য হতে কখনো পারেনি কামনায়, আমার আকাশে
পাখির ডানার মতো বঞ্চনার মেঘ ভাসে, পাপহীন ভালোবাসা শুধু
টিকটিকি হয়ে যায়, স্বপ্নজ্বালা প্রতিশ্রুতিগুলি
একরাশ পাণ্ডুর পিঁপড়ে।
আমি ব্যর্থ অভিমানী রাগী বত্রিশ বছর ধরে
পোড়া বাড়িটার মতো অসহায়, ছেঁড়া পালকের মতো বিচ্ছিন্ন ধুলোয়।

আমার বয়স শুধু ছায়া হলো, বুকের ভিতরে
বুক রেখে হাটে আজ জন্মসূত্রে পাওয়া মেঘ দীর্ঘশ্বাসগুলি,
বুকের ভিতরে, দ্যাখো বত্রিশ বছর ধরে বুকের ভিতরে
ঘুঘুর ডানার মতো সন্ধ্যা কাঁপে, ভাসে
শবের মতন জলে গুলি বেঁধা ইচ্ছাগুলি, আমি
দেশময় শস্য হতে কখনো পারিনি।

বত্রিশ বছর ধরে দীর্ঘশ্বাস অঙ্গারের মতো।
স্বপ্নের ভিতরে তবু স্পার্টাকাস, আর
মাথা খোঁড়ে অন্তহীন ছায়াচ্ছন্ন লক্ষ হ্যামলেট।

বুকের ভিতরে কেউ বুক রেখে কেন গান গেয়েও ওঠে না।

মৃত বন্ধুর জন্যে কয়েক লাইন ।। শান্তনু দাস

দেখো, একটা আকাশ গড়বো
রক্তজবা কুসুমের মতো।
যার চাপ চাপ অন্ধকার বেয়ে
নেমে আসবে—তামাটে শরীরে সেই মানুষের মতো
এই মানুষেরা, আলপথে
মাঠের ওপরে ভেজা, লোনারক্ত ঘামে চষা মাটি,
মাখনের মতো ঘষে মুখে
অথবা কি সুখে বলো
ভোরের ভাঁয়রো হবে লাঙলের গান।

তুমি বলেছিলে—বুকের আগুন হ'বে নদী।
হাপরের লাল-আঁচে কলজেখানা সেঁকে,
মইনুদ্দি, কালুসাহা, মুর্মু-রমনী,
বানাবে মারণ,
টুক টুক, ঠুক ঠুক……। ভেঙে যাবে মধ্যবিত্ত-ঘুম,
রাত্রির সঙ্গম শেষে দ্বিতীয় প্রহরে
জান্‌লার ফোঁকর খুলে দেখে নেবে সব কিছু ঠিক আছে কি না।
মনে রেখো, জেনো,
কালো আকাশেই হয় উল্কাপাত, ছুটে যায় ধূমকেতু কোনো,
যুগে
যুগে।

সে আকাশ আজো আছে।
তোমার ছবির পাশে রেখেছি চন্দন, ধূপ
জন্ম-রাতে কিনে আনি মালা
আর
আমার টেবিলে থাকে রাত্রির তলানি কিছু মদ,
ভালো লাগে কালকের বাসি স্বাদ
ভোরে।
জিভ দিয়ে চেটে নিই ঠোঁট,
মিয়ানো আখরোট দাঁতে কাটি।

তোমার মালার থেকে খসে পড়ে বাসি ফুল
নিঃসঙ্গ সকালে ॥

একজন কবি, দুটি কাব্যগ্রন্থ ঃ কিছু প্রতিক্রিয়া

তর্ক, বিতর্ক, সমালোচনা

'নদীর সময়' প্রসঙ্গে ।। মনীন্দ্র রায়

গৌরাঙ্গ ভৌমিক কবিতা লিখছেন অনেকদিন, কিন্তু গত আট দশ বছরে তাঁর পরিণতি ঘটেছে অতি দ্রুত। ফলে গোড়াকার সেই অস্পষ্টতা এবং পথ হাতড়াবার ইতস্তত ভাব তাঁর কবিতায় নেই। একটি পরিচ্ছন্ন নম্র উচ্চারণে তাঁর কবিতা ক্রমেই বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। আজকের এই নির্বিশেষ কবিতা-চর্চার দিনে, যখন ভালো কবিতা অনেকেই লিখছেন, কিন্তু একজন ভালো কবির থেকে অন্য ভালো কবিকে আলাদা করতে পারা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, তখন এই বিশিষ্ট চেহারা যে কতটা শক্তির পরিচয়, তা মনোযোগী পাঠককে বলে দিতে হবে না।

এই বইতে গৌরাঙ্গ ভৌমিক এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সত্তার মুখোমুখি, যা একালের প্রত্যেক সৎ এবং দায়িত্বশীল লেখকের দায়ভাগ হতে বাধ্য। নিজের ব্যক্তিগত জীবন, পারিপার্শ্ব ইত্যাদির টানাপোড়েনে গৌরাঙ্গ ভৌমিক বুনে তুলেছেন সেই আলো-আঁধারির জগত, যেখানে বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। আসলে তিনি চান পুরনো অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে নতুন আলোয় যাচাই করে নিতে। আর তা করতে গিয়ে তিনি অভ্যস্ত কবিতার অবয়বে একটা নতুন চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এ দুটি ব্যাপারেই তিনি রীতিমতো সার্থক। বিশেষ করে 'কাপুরুষের জন্ম বৃত্তান্ত'-এর মতো কবিতা যার কলমে লেখা হয়, তাকে শক্তিমান বলে স্বীকার করে নিতেই হয়। তিনি লিখেছেন ঃ

১ ।। আমার উজ্জ্বল ইচ্ছার চতুর্দিকে
এখন ধূসর রঙের আলো, আঙুর ফলের কোমল গন্ধ,
গোলাপের পাপড়ি,
আর মৃত্যুর মতো নম্র প্রার্থনার সঙ্গীত।

কিংবা ২ ।। হে জনপদের মানুষ,
স্তব্ধতার কাছে তোমরা আত্মসমর্পন করেছ, করো।
অস্ত্রশালার ওপর বৃষ্টি পড়ুক।
তোমাদের কাছে গচ্ছিত আমার গানের ভাষাগুলি ফিরিয়ে দাও।

এবং ৩ ।। বন্ধু হে, কোথায় আছ ? অন্ধকারে সরাইখানায়
এখনো আমার বাসা। চতুর্দিকে
রোদ্দুরের পাখি উড়ে যায়।

এইসব উপলব্ধি এবং উচ্চারণের কবি একালের কাব্যপাঠকের একান্ত কাছের মানুষ। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কোমল বহুস্তর বর্ণবিন্যাস, নিপুণ শব্দ প্রয়োগ এবং একটা স্পর্শগ্রাহ্য আন্তরিকতার পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য তাঁর কবিতা বিশিষ্ট।□

তরুণ কবির দৃষ্টিতে ।। মনোজ নন্দী

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বা কবিতা পদবাচ্য লেখালেখি যখন আমার খুব কাছাকাছি চলে আসতে সাহসী হচ্ছিল, আর যখন খুব সমাজবিরোধী ভূমিকা পালনের ধৃষ্টতায় আমি কন্ট্রাসেপটিক ব্যবহারে লিপ্ত, সে সময় শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রনীত 'নদীর সময়' কাব্যগ্রন্থটি আমার হাতে আসে। আর রাতারাতি আমি বুঝে যাই আমার সচেতনতা প্রয়োজনহীন, আমার ধৃষ্টতার আমড়াগাছি, আর আমার ভয় আমাকে অক্ষমতার দিকে টেনে নিয়ে যায়।···

সম্প্রতি একটি ছোট কাগজের তরফ থেকে তাঁকে একটি গোলমেলে প্রশ্ন করা হয় ঃ আপনি কি আপনার কবিতাকে হত্যা করতে পারেন ?

জবাবে তিনি জানান, 'না। মাঝে মাঝে অসহায় বোধ করি নিজের অক্ষমতার জন্য। যে কবিতা একবার লেখা হয়ে গেল, তাও তো আমারই সৃষ্টি ! হয়তো কোনোটি পঙ্গু, কোনোটি রক্তহীন। তাদের আমি অস্বীকার করি কি করে ? লজ্জা হয় এবং সেই লজ্জাকে ঢাকার জন্যই আমি পুনরায় কবিতা লিখতে বসি। কেননা, কবিতা আমার বিকল্প নয়, জীবনের সমান্তরাল উপলব্ধির একটি বিচরণ ভূমি। কবিতা আমার সত্তার অবিভাজ্য অংশ।'

গত ১২ বছরের কবিতা, যা 'বৃষ্টিপাত' কিংবা 'রক্তাক্ত রোদ্দুরে' স্থান পায়নি, সেসব কবিতারই নির্বাচিত যে সঙ্কলন, তার নাম 'নদীর সময়'। 'নদী মানেই দীর্ঘ জীবন'—এরকম ভাঙা পংক্তি গ্রন্থের ৯ নম্বর কবিতা 'জন্ম, পুনর্জন্মে' পাচ্ছি এবং ঐ কবিতাতেই 'সময়' আর 'নদী' শব্দ দুটিকে একটি অব্যয়-যোগে পাশাপাশি থাকতে দেখছি। অর্থাৎ চলমান জীবনপ্রবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কবিতাগুলির ভ্রূন জেগে উঠেছে, আর স্বচ্ছ তাদের বয়স্ক বিস্তার। তবুও তিনি কখনো হতাশ। আর বিষাদময় রোম্যান্টিকতা তাঁর আত্মায়। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক—

১ ।। যেন দূর যেতে হবে, সেতু মুখে আশ্চর্য ফুলের হাহাকার।
একলা জেনেছি আমি রাত্রির শিশিরে ভেজা সূর্যমুখী দেখে,
ভিজে ফুল ফুটে উঠলে কোথাও থাকে না অন্ধকার।

২ ।। জন্মের সময়
আমাকে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল মৃত হরিণের ছালে।
চোখ মেলেই দেখেছিলাম, একটি শটাচুর মুখ,
মাকড়শার জালে কয়েকটি মৃত প্রজাপতি
আর মৌমাছির পালক।

'মৃত হরিণের ছাল', 'ষ্ট্যাচুর মুখ', 'মাকড়সার জাল', 'মৃত প্রজাপতি', 'মৌমাছির পালক'—এইসব শব্দ-বন্ধ লক্ষণীয়। এই তাঁর ইমেজ ও প্রতীক ব্যবহারের নৈপুণ্য। আমার অনুভবে এগুলো আলাদা আলাদাভাবে থাকে না, একটা সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে ড্যান গঘ-এর ছবির মত দাঁড়ায়। 'কাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত', 'তৃতীয় অঙ্কের পরিশিষ্ট', 'দুর্ঘটনা', 'ঝড়ের রাতে দাবাখেলা' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা এ গ্রন্থের ঐশ্বর্য। ভাঙা ভাঙা ছবি জোড়ার কাজটা 'দুর্ঘটনা' ও 'ঝড়ের রাতে দাবাখেলা' কবিতায় সাকসেসফুলি এক্সপেরিমেন্টেড।

আমার মনে হয়, বিধ্বস্ত মানুষ তিনি। মানুষের স্বপক্ষে তাঁর কথা বলার প্রবণতা। অথচ তিনি 'সংলাপ বদল করে বেঁচে আছেন রঙ পাল্টানো এক বাড়ির ভেতর'। কেননা, এখন মানুষের বড় দুঃসময়, তার বিশ্বাস নষ্ট করে গেছে সময়ের ক্রূর ভণিতা। তিনি লিখেছেন ঃ

একদা আমার বিশ্বাস ছিল সংশয়হীন,
বিড়ালা বাড়ির দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালেও তার মুখে ফুলের গন্ধ পেতুম,
অন্তত তাকে অবিশ্বাসিনী মনে হত না,
আজ হয়। বস্তুত আমার হৃদয়ে এখন ভালবাসা নেই,
চতুর্দিকে ভালোবাসার নিতান্ত অনটন।

এ রকমই সহজ আর সাবলীল গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কণ্ঠস্বর। তেমন তেমন কেউ এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন, সারল্য কি শিল্পের বিপক্ষে দাঁড়ায় না? তুলনীয় বেন জনসনের হিতোপদেশ ঃ বিকৃতি না থাকলে লেখা আধুনিক হয় না। অর্থাৎ সাদামাটা লেখার দিন শেষ। উত্তরে বলা প্রয়োজন, প্রশ্নটা তেমন জরুরী নয়, যেমন জরুরী—'কবিতা আপাতত ভীষন ড্রাসটিক হবে কিনা'।

পুনশ্চঃ শিল্পীর কোথাও পাপ থাকে, অপরাধী তিনি। 'রক্তিপাত'-এ তিনি লিখেছিলেন—'তুমি সর্বদাই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর/যৌবনের সঙ্গে মৃত্যুর উদ্ভাপ মেশাও/তুমি সর্বদাই পাখি হত্যার মামলা করো।''' এই বোধ কি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের মধ্যে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে? কেননা, তাঁর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। তবে কি তাঁরও একটিই উচ্চারণ ঃ 'আমার কোথাও পাপ আছে।'□

কবির কাছে চিঠি ।। পরেশ মণ্ডল

আপনার 'নদীর সময়' বেশ কয়েকবার পড়েছি। এবং প্রতিবারই আরো ভালো লেগেছে। আমার মতো কুঁড়ে স্বভাবের কারো পক্ষে হঠাৎ এমন পরিশ্রমী হয়ে ওঠা বেশ একটা ঘটনা বৈকি! অন্তত, নিজের কাছে। বোঝা যায়, তার মূলে আপনার নদীর সময় বইখানার অমোঘ আকর্ষণ। অথচ, চমকে দেওয়ার মতো কিছু এ বইয়ে নেই; তার বদলে নম্র, ধীর, গম্ভীর ও রহস্যময় এক আবহ তৈরি হয়ে ওঠে একের পর এক কবিতায়। স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা বিষণ্ণ এক কণ্ঠস্বর, পুরোনো দিনগুলোর জন্য রোমান্টিক আতি এবং তার মিতব্যয়ী রমনীয় প্রকাশ কাব্যগ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। প্রবাসী, রাত্রির কাছে, বুদ্ধ-

পূর্নিমা, দূরের ঘন্টা, মধ্যদিন মধ্যরাত ও একটি সকাল প্রভৃতি অনেক কবিতার কথা সহজে মনে পড়ে। যখন আপনি লেখেন—

'চতুর্দিকে
ভিক্ষুকের দল করুণাপ্রার্থী।' (চিরশ্রীর প্রেমিকেরা)

তখন এবং তখনই আপনার মতো স্বাবলম্বী কোনো কবির ব্যক্তিত্ব, স্বভাবতই, আমাদের সচকিত করে। কষ্ট হয়, যখন জানতে পারি কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিক বড়ই একাকী, বিষণ্ণ এবং স্মৃতিচারী। অথচ কী আশ্চর্য, আন্তরিক উচ্চারণ কতই না সাদৃশ্যময় হয়ে ওঠে, যখন দেখি—আপনি লেখেন ঃ 'আমার স্বদেশ ছিল দূরতম দৃশ্যের মতন।'

মনে পড়ে হাইনরিস হাইনের নির্বাসনে' কবিতাটির একটি পংক্তি ঃ 'একদা আমার সুন্দর স্বদেশ ছিল।' কিংবা, অ্যাঁলা হুবগ্রিয়ের La Plage গল্পটির আবহগত মিল খুঁজে পাই 'দূরের ঘন্টা' কবিতায়—

'উপকূল-রেখাগুলি
দূরের ঘন্টার শব্দে আরো দূরে
যেন সরে যায়।'

প্রভাব নয়, কিন্তু আশ্চর্য এক সাদৃশ্য ঘটে যায় কখনো কখনো। এবং তখন আরো বেশি ভালো লাগে আপনার কবিতার আন্তরিক সম্মোহ!□

গৌরাঙ্গবাবু শুনুন ।। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়

'নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' পড়েছি। কবিতাগুলো ৭০-৭১-এর মধ্যে লেখা, বলেছেন। কবে লেখা না লেখা তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, পাঁচ ছটি কবিতা প্রায় দশ বছর আগের লেখা, সেগুলো বইয়ের মধ্যে মিশে থাকলেও টোটাল এফেক্ট ক্ষুন্ন হয়নি কোথাও। অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ মেজাজে কোথাও সুর বা তাল কেটে যায়নি।

১। আপনার শব্দ ব্যবহার, পংক্তি বিন্যাস, বাচনভঙ্গি ইত্যাদিতে কোথাও আড়ষ্টতা নেই—সরল ও সাদাসিধে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝতে হয় না, হৃদয়গ্রাহী। বুদ্ধিমত্তার অহেতুক কারিকুরি নেই, তাই চাতুর্যহীন। প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তির ও ব্যবহৃত অর্থের জন্য মাথা ঘামাতে হয় না, অথচ প্রতিটি শব্দ আপনি যথামথই ব্যবহার করেছেন। এবং তা স্বতস্ফূর্ত। সেই কারণে আপনি খুব সহজেই মর্মে প্রবেশ করতে পারেন।

আপনার শৈশব, যা আপনি ফেলে এসেছেন বলে বেদনাহত এবং ফিরে ফিরে পেতে ভালোবাসেন, তা সত্যিই উজ্জ্বল। আপনার এই শৈশব বারবার স্পর্শ করেছি বিভিন্ন পংক্তি ও শব্দের মাধ্যমে। আমাকে নাড়া দিয়েছে। আসলে, আমার মনে হয়, এই শৈশবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তো শিল্প।

৩। আপনার একটা উদ্যান আছে—আশ্চর্য উজ্জ্বল নদী, নির্জনতা, পাখি আকাশ, স্মৃতি, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ইত্যাদিতে তা ভরপুর। বোধহয় এ উদ্যান বিভিন্ন অনুষঙ্গে সকলেরই অভ্যন্তরে থাকে। আপনার সেই উদ্যানে

মাঝে মাঝে দুরন্ত হাওয়া, জ্যোৎস্নাহীন রাত, গঙ্গার তীরের মতো ভাঙন, ক্ষয় ইত্যাদি ফিরে ফিরে আসে। আপনি কিন্তু সেইসব অস্থিরতা বা বিপরীতমুখী জল-বায়ুর মধ্যে অলৌকিক কোনো সূর্যোদয় দেখতে চান - একটা প্রত্যাশায় আপনি ভীষণ উন্মুখ। ঠিক প্রত্যাশা নয়, একটা দৃঢ় বিশ্বাস আপনাকে জাগিয়ে রাখে—'অবশ্য পৌঁছুতে হবে./আজ কিংবা কাল হোক'। 'একটা সমভূমির জন্য' ব্যাকুলতার মধ্যেও আপনার চরিত্র অনুরূপ স্পষ্ট।

৪। এ ছাড়া সংশয়ী সম সময়ের যে চরিত্র আপনি 'দুর্দান্ত আগুন তুই পেয়েছিলি' কবিতায় উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন, তা সুন্দর। এই তো হয়, এই তো স্বাভাবিক। সম-সময় বড় বেশী সংশয়ী ও দ্বান্দ্বিক। এবং সেই কারণে প্রতারক ও দুরন্ত। এই সময় কী যে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা—সেসব না জেনে কেউ যদি হেমন্তের উদ্যান পোড়ায়, প্রেমিকার শবও, আত্মঘাতী ভুলের সম্মোহে আচ্ছন্ন না হয়, তবে যে কি করে পরবর্তীকালে নিজেকে খুঁজে পাবে—তার প্রেম-অপ্রেম, সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, বা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে? সমসময়ের বিসর্জিত অস্থিরতা পরবর্তীকালে যে সংরক্ত গোলাপ হয়ে ফোটে, তাই-ই তো অক্ষয় হয় বুকের মধ্যে!

৫। আরও আপনার কিছু কিছু কবিতা, যেমন-উলান উৎসব, জানি ভোরে কেউ আসবে, তিনটে জানালা, ভ্রমণ বিষয়ক তিনটে কবিতা, প্রকীর্ণ কবিতাবলীর কয়েককটি সর্গ, সার্কাস, শোক, এবং আয়ত্ত সংলাপ আর কিছু কিছু পংক্তি, যেমন—'হাত দিয়ে ছুঁই দীর্ঘ আকাশ সম্মেলনের দিনে' 'অলৌকিক হাহাকারে বেজে যায় বেজে ওঠে অদৃশ্য তানপুরা', 'সারাটা রাত ঘুমের মধ্যে পর্যটকের ঘোড়া। একেকটি দ্বীপ পেরিয়ে যায়, দ্বীপের ঘরবাড়ি', রুটির শব্দে শুনেছিলাম অলৌকিক কড়ানাড়ার শব্দ', 'পুরোনো পিয়ন তবু আমাদের চিঠিগুলো/রেখে গেছে এক বুক মাটির গভীরে' ইত্যাদির উল্লেখ করাও অত্যন্ত জরুরী মনে করি।

৬। তবে 'নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' আপনি মধ্যপন্থী কেন? এই 'মধ্যপন্থী' কথার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি। আবার 'জানি না বলেই আজো ডাঙিনি আড়াল' যখন লেখেন, তখন প্রশ্ন জাগে—কি অজানা? কোথায় আড়াল?

৭। আপনি লিখেছেন—'চৌকাঠে দিগন্ত মিশলে ভালোবাসা তরঙ্গমুখর'। খুব ভালো লাইন। উপলব্ধিজাত। কিন্তু আমি ঠিক বিপরীত বোধে মাঝে মাঝে আক্রান্ত হই। আমার মনে হয়, ভালোবাসা তরঙ্গমুখর হলেই চৌকাঠে দিগন্ত এসে মেশে।... আর একটা কথা। 'নতুন ঘরে যাবার সময়' কবিতার 'তবু কাউকে রাখা যায় না মুঠোর ভেতর' লাইনটা আমি 'তবু কাউকে যায় না রাখা মুঠোর ভেতর'—এইভাবে পড়েছি।□

আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক

* নদীর সময়॥ উল্লথা প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, আংার গ্রাউণ্ড ২ কলকাতা ১২॥ দাম তিন টাকা॥

* নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ॥ বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৯॥ দাম তিন টাকা॥

পাপ গত দিন ক্ষয় হয়॥ সত্য গুহ

জ্বলতে জ্বলতেই যেন ভোর হয়
সকালের প্রত্যক্ষ বিষয়
নীড় দোর ছেড়ে নামে ঘাসে ধূলে ঠাণ্ডা পাখি ক্লান্ত চোখ লোক
পরস্পর মুখোমুখি হওয়া তো প্রকাশ করা ক্ষুধা ও হাদয় নিয়ে শোক
অভিনন্দনান্তে প্রাতঃকালীন
কী আগুন জ্বালানো যে দিন, হায়, টেকাই কঠিন

রোড রোলারের শব্দ রক্তের সড়কে বুঝি গুড়ায় পাথর
একদা এমন ক্ষণে সেতারে বোলানো হোতো বেহাগের—ভৈরব ছড়
ভালো লাগবার মতো দেখা যেতো ফুল, দেখলে ভালো যায় দিন এমন অনবদ্য মুখ
এখন তো পৃথিবীর গভীর অসুখ
সব কি রকম যেন হয়ে গেছে স্পষ্ট মাত্র ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর কামার্ত বাইশন
ভালোবাসা হয়না এখন

সারাদিন খুঁজে ফিরি ভাত সিদ্ধের ঘ্রাণ
নিঃশ্বাসে বাতাসে কান পেতে রাখি যদি আসে মৃত্তিকার শাঁখা কিম্বা শাঁখের আহ্বান
কখনো, সমস্ত রাত চোখে রাখি দুরন্ত দূরবিন
যদি মুমূর্ষুর শেষ চেতনার মতো জ্বলে কোথাও এক ছিটে কেরোসিন
এবং একটুখানি রসনীয় ছোঁয়া পেতে শারীরিক বিষয় আশয়
নিজের উটের গলা তছরূপ কার মধ্য মরুতে যাত্রীর মতো, হায়, পড়ে রয়

তবু চাকা ফিরে আসে জ্বলতে জ্বলতেই যেন ভোর জন্ম লয়
দিন গত পাপ ক্ষয়, পাপ গত দিন ক্ষয় হয়॥

শয়তান ও ঈশ্বরের রাজত্বে ।। জয়ন্ত কুমার

কালো রাত্রির গহ্বরে চক্‌চক্‌ করছে
রূপোলি মুদ্রা, তাই নাও। সুখের স্বপ্ন দেখাচ্ছে শয়তান। আর
ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস মানেই মনুন্তর,
মহামারী।

মন্দির বানিয়ে আমি কারো ভৃত্য হতে চাইনি,
না শয়তানের, না ঈশ্বরের।
এখন দেখছি উভয়েই এক সমতলের বাসিন্দা।

উভয়ের যৌথ রাজত্বে আমি মানুষ হব কেমন করে?

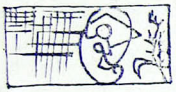

প্রদেশ ।। সরোজ মহাপাত্র

আমাকে আগল দিতে
মনের বেড়া
আর বাড়িও না
স্থান সঙ্কুলানের পরিধি
জ্যামিতি মানে না।
আমি হারিয়ে যাবই
ধূ ধূ করা তেপান্তরে।

ফুলের গন্ধ
নাই বা মাখালে শরীরে
সাইক্লোনে
পরাশ্রয়ী মাটি কাঁপে
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে।

অনুভব ॥ কবিতার মাসিক ॥ নবপর্যায় প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ॥ জুলাই ১৯৭৪ ॥ আট পয়সা
ANUBHAV (Poetry Monthly), VOL. I No. 1. JULY 1974. PRICE 60 PAISE

গৌরাঙ্গ ভৌমিক সেই কবি, যাঁর কবিতায় কোলাহল করে সময়, এবং মহাকাল। কিছুকাল আগে তিনি 'যুদ্ধ করেছেন নিজের বিরুদ্ধে। এখনও বলেন, 'স্বনিমিত মুকুটে যিনি সম্রাট নন, সে কবির মৃত্যু হোক অপঘাতে।' তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক উল্‌থা প্রকাশন। আপনি পড়েছেন কি ?

নদীর সময় ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ।। তিন টাকা ।।
অশুভ সঙ্গীত ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ।। চার টাকা ।।

কবির সাম্প্রতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কৃষ্ণ ধরের কবিতা একটি প্রবল প্রতিবাদ। কবিতার চেয়েও সার্থক তিনি কাব্য নাটকে। কাব্য নাটকে ব্যবহৃত তাঁর ভাষায় ঘটেছে লৌকিক, অলৌকিকের সার্থক সম্মিলন। পড়েছেন কি তাঁর কোনো কাব্যনাটক ?

পদধ্বনি পলাতক ।। কৃষ্ণ ধর

হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রে শলভ শ্রীরাম সিং স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত একটি নাম। শলভ বলেন 'কুকুর আর সমালোচকদের আমি ঘৃণা করি। তাঁর একুশটি কবিতার অনুবাদ করেছেন শ্রীজয়ন্ত কুমার।

ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ।। শলভ শ্রীরাম সিং
অনুবাদ জয়ন্তকুমার

হিন্দী পাঠকদের জন্য বাংলা সাহিত্য
মুঝে জিনে দো মুঝে জাগনে দো ।। মণীন্দ্র রায় ।। চার টাকা ।।
নদী কা সময় ।। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ।। চার টাকা ।।
পিপাসা ।। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ।। আট টাকা ।।

উল্‌থা প্রকাশন/৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, (আণ্ডার গ্রাউণ্ড নং ২)
কলকাতা-১২

EDITOR : JAYANTKUMAR
Published by Sri Virendra Nath Mishra from 33, Chittaranjan Avenue (Underground No. 2) Calcutta-12 Printed by A.K. Dey Hazra from Chandimata Printers & Stationers, Haripur Road, Cuttack-1.
Cover : ASHES MITRA